(এক)

প্রচলিত পুরাণ- কাহিনী বা মীথের নতুন ভাষ্য রচনা করেন পরবর্তীকালের সাহিত্যস্রষ্টা — এমন উদাহরণ অজস্র মেলে। যেমন গ্রীক পুরাণের আন্তিগোনের কাহিনী নিয়ে পরবর্তীকালে অনেক রচনা লিখিত হয়েছে। গ্রীক পুরাণের ইফিগেনিয়াকে নিয়ে নাটক লিখেছিলেন ইউরিপিডিস। পরে ফরাসী নাট্যকার রাসিন ইফিগেনিয়ার কাহিনী নিয়েই লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত 'Iphigenie' নাটক। সোফোক্লিসের 'Electra' নবরূপ পরিগ্রহ করেছে ইউজিন ও নীলের 'Mourning becomes Electra' নাটকে। ফরাসী নাট্যকার কক্তোর 'The Infernal Machine'— নাটকের কাহিনী সোফোক্লিসের নাটক থেকে গৃহীত। মীথের নবরূপায়ণের এমন দৃষ্টান্ত এদেশেও বিরল নয়। মহাভারতীয় উপাখ্যানের নতুন ভাষ্য রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ 'বিদায় অভিশাপে', 'চিত্রাঙ্গদা'য়, 'কর্ণকুন্তীসংবাদে', 'গান্ধারীর আবেদনে', 'নরকবাস'-এ। তাঁর 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া'য় রামায়ণ-কাহিনী নবরূপে গৃহীত হয়েছে। 'মালিনী' নাটিকা ও 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের ('পরিশোধ' কবিতা) মূল বৌদ্ধ কাহিনী। 'উত্তরচরিতে'-র কাহিনী ভবভূতি নিয়েছিলেন রামায়ণ থেকে। দ্বিজেন্দ্রলাল 'সীতা' নাটকে ভবভূতির কাহিনীর মৌলিক পরিবর্তন সাধন করেন। আসলে পুরাণ কাহিনীর মধ্যে মানুষের চিরায়ত রূপের এমন পরিচয় ফুটে ওঠে যে পরবর্তী লেখকরা আধুনিক জীবন-সমস্যা রূপায়িত করতে গিয়ে বারবার পুরাণের শরণাপন্ন হয়েছেন। মীথকে আশ্রয় ক'রে বা অন্যের রচনার রূপান্তর ঘটিয়ে উত্তরসূরি কর্তৃক তার নতুন ভাষ্যরচনা এক ধরনের ব্যাপার।

অন্যদিকে সাহিত্যক্ষেত্রে বহু শিল্পীকে দেখি যাঁরা অতৃপ্ত এবং শৈল্পিক অতৃপ্তি নিরাকরণে সংস্করণে সংস্করণে তাঁদের রচনাকে পরিবর্তিত ক'রে চলেন। কখনো কখনো এই পরিবর্তন একটি স্বতন্ত্র শিল্পরূপের জন্ম দেয় যার সঙ্গে মূল

রচনার মিল সামান্যই । এমনিতর শৈল্পিক অতৃপ্তিবোধ ও সংস্করণে সংস্করণে রচনাকর্মের পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ, ইয়েট্‌স ও সুধীন্দ্রনাথের সাহিত্যে বহুল-পরিমাণে মেলে । নানা সংস্করণে রবীন্দ্রনাট্যের প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছে । কিন্তু "এই জাতীয় সংস্কার-পরিমার্জনা-সংশোধনগত ব্যাপক পরিবর্তন সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ পরিবর্তিত রূপগুলিকে একই নাটকের সংস্করণান্তর বলে গণ্য করেছিলেন।"[১] কিন্তু কোন কোন সময় এই পরিবর্তন এমন মৌলিক যে পরিবর্তিত রূপকে পূর্বরূপ থেকে স্বতন্ত্র করার জন্য তিনি নাটকটিকে নতুন নাম দিয়েছেন ।

কিন্তু তৃতীয় এক জাতীয় রূপান্তর হয় যখন একজন লেখক নিজেরই এক রূপকল্পের রচনাকে অন্য রূপকল্পে পরিবর্তিত করেন, — যেমন ছোটগল্প থেকে উপন্যাসে বা উপন্যাস থেকে নাটকে অথবা গল্প থেকে নাটকে — এমন দৃষ্টান্ত বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গণে একান্ত বিরল । একালের বাংলা সাহিত্যে এর দৃষ্টান্ত পাই যেমন রবীন্দ্রনাথের রচনায় তেমনি তারাশংকরের সাহিত্যে । রবীন্দ্রনাথ ও তারাশংকর নব নব রূপ, রূপান্তরের মধ্য দিয়ে তাঁদের সৃজনকর্মকে পরিচালিত করেছেন । সৃষ্টির রূপান্তর — সাধনে রবীন্দ্রনাথ যেসব প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছেন তার সঙ্গে তারাশংকরের রূপান্তর-সাধন-প্রক্রিয়ার তুলনামূলক আলোচনা সাহিত্যরসিকদের কাছে যথেষ্ট কৌতূহলের বিষয় বলে পরিগণিত হতে পারে ।

বস্তুত বাংলা সাহিত্যে আর কোনো সাহিত্যস্রষ্টাই রবীন্দ্রনাথের মতো আপন সৃষ্টিকে এতবার নব নব রূপ, রূপান্তরের মধ্য দিয়ে নিয়ে যান নি । মহৎ শিল্পীর অতৃপ্তি তাঁর মধ্যে এতই প্রবল ছিল যে বারংবার আপন রচনাকর্মকে পরিবর্তিত করেও যেন তাঁর তৃপ্তি ছিল না । এই পরিবর্তনের ধারা বয়ে চলেছে নানাভাবে । কখনো এই পরিবর্তন নেহাতই সংস্করণগত । কখনো এক রূপ থেকে অন্য রূপে । আবার কখনো বা সংস্করণগত পরিবর্তন করতে করতেই কবি নূতন

সৃষ্টিতে পৌঁছে যান । রূপকর্মগত পরিবর্তনের সঙ্গে মিশে যায় কবির জীবনভাবনাগত পরিবর্তন ।

রূপান্তরের শিল্পী রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টিকে বিচিত্র পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিচালিত করেছেন । কখনো কবি তাঁর গল্পকে নাট্যরূপ দিয়েছেন , কখনো উপন্যাস অবলম্বনে নাটক লিখেছেন , কখনো বা কবিতাকে নাটকে রূপান্তরিত করেছেন । কখনো তাঁর হাতে গদ্যনাটক পরিবর্তিত হয়েছে পদ্যনাটকে । কখনো ঘটেছে তার ঠিক বিপরীত । আবার রবীন্দ্রনাথ শুধু তাঁর অন্যজাতীয় রচনার বিষয়বস্তু পরবর্তী নাট্যরচনায় প্রয়োগ করেন নি , একই নাটকের বিকল্পরূপও রচনা করেছেন । যেমন , 'শারদোৎসবে'-র বিকল্পরূপ 'ঋণশোধ' বা 'অচলায়তনে'-র বিকল্পরূপ 'গুরু' । "এই দ্বিতীয়রূপগুলির দ্বারা কিন্তু প্রথমরূপগুলি বাতিল বলে গণ্য হচ্ছে না — একই কাহিনী অবলম্বনে দুটি নাট্যরূপই স্বতন্ত্র নাটকের স্বীকৃতি পাচ্ছে।"[২]

(দুই)

রবীন্দ্রনাথ ও তারাশংকর — দু'জনই তাঁদের কিছু গল্পকে পরবর্তীকালে নাটকে রূপান্তরিত করেছেন । রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এমনিতর গল্পের সংখ্যা পাঁচ । যথা , 'মুকুট' (১২৯২) গল্প থেকে ঐ নামের নাটক (১৯০৮) , 'শেষের রাত্রি' (১৩২১) থেকে 'গৃহপ্রবেশ' নাটক (১৯২৫) , 'কর্মফল' গল্প (১৩১০) থেকে 'শোধবোধ' নাটক (১৯২৬) , 'একটি আষাঢ়ে গল্প' (১২৯৯) থেকে 'তাসের দেশ' নৃত্যনাট্য (১৯৩৩) , 'মুক্তির উপায়' গল্প (১২৯৮) থেকে ঐ নামের নাটক (১৩৪৫) । রবীন্দ্রনাথের মতো তারাশংকরও 'নটু মোক্তারের সওয়াল' (১৩৪৪) ও 'পিতাপুত্র' (১৩৪৬) গল্প দু'টিকে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ক'রে 'দুই পুরুষ'

(১৩৪১) ও 'সংঘাত' (১৩৬১) নাটক দু'টি রচনা করেন। এছাড়া, 'আমড়াইয়ের দীঘি' (১৩৪০) ও 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা' (১৩৫৮) গল্প দু'টি আংশিক অনুসরণ ক'রে তিনি যথাক্রমে 'দ্বীপান্তর' (১৩৫০) ও 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা' (১৯৬০) নাটক দু'টি নির্মাণ করেন।

নাট্যরূপ দিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর যে পাঁচটি গল্প নির্বাচন করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্তত তিনটি — 'মুকুট', 'শেষের রাত্রি' ও 'কর্মফল' — সংলাপপ্রধান ও প্রায় বর্ণনাবর্জিত। ফলে এদের নাট্যরূপান্তরে কবিকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। নাট্যরূপে অনেক সময় মূল গল্পের কয়েকটি পরিচ্ছেদ মিলে একটি দৃশ্য রচিত হয়েছে। যেমন, 'মুকুট' গল্পের প্রথম তিন পরিচ্ছেদ মিলে গড়ে উঠেছে 'মুকুট' নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য। অনেকক্ষেত্রেই গল্পের ছোট ছোট অংশবিভাগগুলি জুড়ে এক-একটি নাটকীয় দৃশ্য সৃষ্ট হয়েছে। গল্পকে নাটকে রূপান্তরিত করতে রবীন্দ্রনাথ ও তারাশংকর যে প্রক্রিয়াগুলি গ্রহণ করেছিলেন তাদের তুলনামূলক আলোচনা এই সূত্রে প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হতে পারে।

১। গল্পকে নাটকে পরিবর্তিত করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও তারাশংকর — দু'জনকেই নূতন নূতন চরিত্র সংযোজিত করতে হয়েছে। এই সংযোজন বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য সৃষ্টির সহায়ক। এছাড়া, অনেক সময় পুরনো চরিত্র বর্জিত হয়েছে অথবা পরিবর্তিত হয়েছে।

'মুকুট' নাটকে যুক্ত হয়েছে একটি নূতন চরিত্র, বিদূষক রাজধরের বয়স্য, তার 'মামাতো ভাই' ধুরন্ধর। গল্পের নারীচরিত্র, ইন্দ্রকুমারের স্ত্রী কমলাদেবী, নাটকে নেই। 'গৃহপ্রবেশে' হিমি ও অখিল নূতন চরিত্র। 'শেষের রাত্রি' গল্পে এরা ছিল না। ডাক্তার ও প্রতিবেশিনীরা নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে কারণ এদের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ মণি ও মাসি সম্বন্ধে সমাজের ধারণা ও

প্রতিক্রিয়া অনেক বেশি স্পষ্ট করতে পেরেছেন। তবু 'গৃহপ্রবেশ' নাটকের বিরুদ্ধে বস্তুভিত্তির শিথিলতার অভিযোগ উঠেছে।[৩] গল্পে মণি ছিল নিষ্ঠুর এবং সেই নিষ্ঠুরতা অনেকটাই অকারণ। নাটকে তাকে কিন্তু ততটা নিষ্ঠুর বলে মনে হয় না। 'কর্মফল' গল্পের নাট্যরূপ 'শোধবোধে' নলিনীর বন্ধুরূপে চারুবালা স্থান পেয়েছে; নন্দী কিছু বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। 'মুক্তির উপায়' গল্পে কোনো গুরুর কথা ছিল না। নাটকে গুরু সশরীরে উপস্থিত। পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করতে গিয়ে বলদেও প্রভৃতি নূতন চরিত্র আনতে হয়েছে। গল্পে নায়িকা ছিল হৈমবতী, নাটকে নায়িকা হ'য়ে উঠল পুষ্পমালা। মাখনলাল গল্পে ছিল ষষ্ঠীচরণের ছেলে। নাটকে সে হ'য়ে গেল ষষ্ঠীচরণের নাতি। এর কোনো কারণ নেই।

তারাশংকরের 'দুই পুরুষ' নাটকে বহু চরিত্র নূতন যারা বীজ গল্প 'নুটু মোক্তারের সওয়ালে' ছিল না। যেমন, কল্যাণী, সুশোভন, মমতা, অরুণ, বরুণ, শ্যামা প্রভৃতি চরিত্র গল্পে ছিল না, অথচ নাটকে এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া নাটকীয় প্রয়োজনে বেশ কিছু পার্শ্বচরিত্র গড়ে উঠেছে যারা গল্পে ছিল অনুপস্থিত। আবার কোনো কোনো চরিত্র গল্প থেকে নাটকে অনেকটাই বদলে গেছে। যেমন, গল্পের বৃদ্ধ মুন্সেফবাবু নাটকে নুটুবিহারীর বন্ধু কমলাপদে রূপান্তরিত। কোনো কোনো চরিত্র, যারা গল্পে ছিল নামরূপহীন তারা নাটকে নামরূপ পরিগ্রহ করেছে। গল্পের নামহীন জমিদাররা নাটকে তাই শিবনারায়ণ-দেবনারায়ণ; নুটুর স্ত্রীর নাম বিমলা, গল্পের নুটুর নামহীন পুত্রকন্যারা নাটকে অরুণ-বরুণ-শ্যামা। গল্পে মহাভারতের ঘরে আগুন লাগিয়েছিল এক 'দীর্ঘকায় কালো জোয়ান', নাটকে সে কালী বাগ্দী। ঐ চরিত্রগুলির শুধু নামই নাটকে সংযোজিত হয় নি, তাদের ক্রিয়াও নাট্যকাহিনীকে জটিল করেছে।

তারাশংকরের 'পিতাপুত্র' গল্পটি যখন রূপান্তরিত হল 'সংঘাত' নাটকে তখন তাতে বহু নূতন চরিত্র সংযোজিত হল। এই সংযোজনের ফলে নাটকটি যে রূপ পেল তাতে গল্পের সঙ্গে নাটকের মিল রইল সামান্যই। হরকুমার ঘোষাল, সুষমা, দ্বারিকানাথ চৌধুরী, ব্রজনাথ, মনোরমা, নরেন্দ্র, মথুরানাথ, ত্রণাক্ষী, মৌলানা প্রভৃতি চরিত্র গল্পে ছিল না, নাটকে এরা নিজ নিজ ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করেছে। কোনো কোনো চরিত্র পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন গল্পে শশিশেখরের স্ত্রী চারু নাটকে সতী-তে রূপান্তরিত। তার চরিত্রও পাল্টে গেছে। গল্পে সে শশী-র অনুবর্তিনী, নাটকে সে শশীর আদর্শের বিরোধী। গল্পে শশী আত্মহত্যা করেছিল, নাটকে সে দেশত্যাগ করলেও পরে ফিরে আসে। এমনকি ন্যায়রত্নও নাটকে রূপান্তরিত হয়েছেন। গল্পে তিনি অপরিবর্তিত ছিলেন। চন্দ্রশেখরের বাল্যরূপ দেখিয়েই গল্প শেষ হয়, নাটকে তাকে দেখি পূর্ণযৌবনে।

'আখড়াইয়ের দীঘি' গল্পের ছায়াবলম্বনে রচিত 'দ্বীপান্তর' নাটকেও বহু নূতন চরিত্রের আগমন ঘটেছে। জমিদার ধনদাপ্রসাদ, তাঁর পুত্র প্রমদা, পদ্ম, টগর প্রভৃতি চরিত্র গল্পে অনুপস্থিত। গল্পের কালী বাগ্দী, তার পুত্র তারাচরণ নাটকে অনেকটাই পরিবর্তিত। নাটকে তারাচরণের কবিয়াল-সত্তার ওপর প্রভাব পড়েছে 'কবি'-র নিতাই কবিয়ালের। 'কবি'-র রাজন্ এখানে রাজু মিয়াঁ। পদ্মর ওপর 'কবি'-র বসনের প্রভাব স্পষ্ট। অথচ গল্পে পদ্ম বা রাজু মিয়াঁ ছিল না। তারাচরণও সেখানে কবিয়াল নয়, লাঠিয়াল।

২। গল্পের নাট্য-রূপান্তরে রবীন্দ্রনাথ ও তারাশংকর দু'জনই বহু নূতন ঘটনা সংযোজিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'শোধবোধ' নাটকে গল্পের ভাদুড়ি পরিবার হয়েছে লাহিড়ি পরিবার। নাটকের প্রথম দৃশ্যে নলিনীর জন্মদিন-উৎসবের বিবরণ

গল্পে ছিল না। সোনার গুড়গুড়ির প্রসঙ্গ, নলিনী কর্তৃক নন্দীকে প্রত্যাখ্যান, নন্দী-চারুবালার নূতন সম্পর্ক—এগুলি সম্পূর্ণ নূতন। এদের কোনো সংকেত গল্পে ছিল না। 'গৃহপ্রবেশ' নাটকে হিমির প্রতি অখিলের আকর্ষণ, বাড়িবন্ধকের ব্যাপারে অখিলের চক্রান্ত নূতন উপাদান, গল্পে এগুলি ছিল না। পাটের ব্যবসায় সংক্রান্ত কথাবার্তাও নূতন। 'তাসের দেশ' নৃত্যনাট্যে বংশমর্যাদা, প্রায়শ্চিত্তবিধি, সংস্কার, নিয়ম, শাস্ত্রমতে জাতির উৎপত্তি-বিবরণ, খবরের কাগজে ভাষা, রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক আইন ইত্যাদিকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে, 'একটি আষাঢ়ে গল্পে' এদের চিহ্নমাত্র ছিল না। গল্পে তাসিনীদের ঈর্ষার সংকেত ছিল, নাটকে তা বিস্তারিত। 'মুক্তির উপায়' গল্পটিকে যখন সাতচল্লিশ বছর পর নাট্যরূপ দেওয়া হ'ল তখন তাতে অনেক সমসাময়িক উল্লেখ-অনুষঙ্গ প্রবেশ করল যেগুলি নাটকের সঙ্গে মানানসই হয় নি।

তারাশংকরের 'নুটু মোক্তারের সওয়াল' গল্পটিকে 'দুই পুরুষ' নাটকে রূপান্তরিত করতে কল্যাণী-নুটু-বিমলার ত্রিভুজ প্লটে জটিলতার মাত্রা যোগ করেছে। অরুণ-মমতার সম্পর্ক নিয়েও খানিকটা জটিলতা সৃষ্ট হয়েছে। নাটকের শেষ পর্যায়ে পিতাপুত্রের বিরোধকে কেন্দ্র ক'রে নূতন দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। গল্পে এ-সবের ছায়ামাত্র ছিল না। 'পিতা-পুত্র' গল্পে মূল বিষয় ছিল দুই পুরুষের দ্বন্দ্ব। 'সংঘাত' নাটকে এই দ্বন্দ্বের সঙ্গে আরো বিচিত্র বিষয় যুক্ত হয়েছে, — কখনো প্রাসঙ্গিকভাবে, কখনো অপ্রাসঙ্গিকভাবে। সুষমাকে নিয়ে হরনাথের পরিবারের সঙ্গে দ্বারিকানাথের পরিবারের দ্বন্দ্ব-সংক্রান্ত ঘটনাবলী গল্পে ছিল না। গল্পে পিতাপুত্রের দ্বন্দ্ব ছিল দুই কালের দুই আদর্শের দ্বন্দ্ব। নাটকে এই দ্বন্দ্ব পরিবারের সীমা ডিঙিয়ে সমাজে বিস্তৃত হয়েছে।

'আখড়াইয়ের দীঘি' গল্পটিকে 'দ্বীপান্তর' নাটকে রূপান্তরিত করার সময় লেখক ধনদাপ্রসাদ - পদ্মা - প্রমদা সংক্রান্ত কাহিনী যুক্ত করেন। ধনদা ও কালীচরণের মধ্যে রঙের সম্পর্ক আবিষ্কারও নূতন উপাদান। তারাচরণের কবিয়াল - জীবনও নয়া সংযোজন। এছাড়া বহু অতিনাটকীয় ঘটনাও সংযোজিত হয়েছে। 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা' নাটকটি ঘটনাগত দিক দিয়ে গল্পটিকে প্রায় রেখায় রেখায় অনুসরণ করেছে।

৩। রূপান্তর যেখানে জন্মান্তর —

'একটি আষাঢ়ে গল্পে' (১২৯১) সেই তাসরাজ্যের কথা পাই যেখানে 'চমৎকার শৃঙ্খলা'। কিন্তু 'বিদেশ হইতে তিনটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত' এসে সব বিশৃঙ্খল ক'রে দিল। রাজপুত্রের প্রেমে হরতনের বিবি নারী হ'য়ে উঠল। রাজপুত্রের সঙ্গে তার বিয়ে হ'ল। তারা হ'ল তাসের দেশের রাজা ও রাণী। এই গল্প অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ নৃত্যনাট্য 'তাসের দেশ' (১৯৩৩) রচনা করেন যা হ'য়ে উঠল সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি। এই নূতন সৃষ্টিতে শুধু জড়ত্ব নিন্দিত ও প্রাণ বন্দিত হয় নি, নানা বিষয় নিয়ে হাস্য - পরিহাস করা হয়েছে। গল্পে ব্যঙ্গ ছিল না। নাট্যরূপে ব্যঙ্গই প্রধান। গল্পে তাসিনীদের ঈর্ষা ইঙ্গিতে ছিল, নাটকের বৃহত্তর পরিসরে তা বিস্তারিত। দ্বীপময় ভারতে যুরোপ - নৃত্য দেখার অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথকে 'তাসের দেশ'— রচনায় প্রেরণা দিয়েছে।

তারাশংকর যখন 'নুটু মোক্তারের সওয়াল'-কে 'দুই পুরুষে' অথবা 'পিতাপুত্র'-কে 'সংঘাতে' পরিবর্তিত করলেন তখন সেই দু'টি রূপান্তরিত রচনা হ'য়ে উঠল অনেকাংশে নূতন সৃষ্টি। 'আখড়াইয়ের দীঘি' গল্পের

ছায়াবলম্বনে যখন গড়ে উঠল 'দ্বীপান্তর' নাটকটি তখন যেন রূপান্তর ঘটে গেল।

৪। গল্পকে নাট্যরূপ দিতে রবীন্দ্রনাথ ও তারাশংকর — দুজনই কিছু গান সংযোজিত করেছেন। 'গৃহপ্রবেশ' নাটকে হিমির মুখে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি গান বসিয়েছেন। অথচ 'শেষের রাত্রি' গল্পে হিমি চরিত্রটিই ছিল না। 'একটি আষাঢ়ে গল্প' যখন 'তাসের দেশ' নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত হল তখন তাতে বহু গান যুক্ত হল। গানগুলির ভাষাবৈচিত্র্য এবং ভাবের সঙ্গে ভাষা ও সুরের সহমর্মিতা লক্ষণীয়। 'কর্মফল' গল্পটি যখন 'শোধবোধ' নাটকে পরিবর্তিত হ'ল তখন তাতে নলিনীর কণ্ঠে কয়েকটি গান প্রযুক্ত হল।

'দুই পুরুষে' চারটি গান যুক্ত হয়েছে। প্রথমটি ('যারা তব শক্তি লভিল নিজ অন্তর মাঝে') রবীন্দ্রনাথের। কল্যাণীর কণ্ঠে গীত 'হে ভুবনেশ্বর' সজনীকান্ত দাসের রচনা। অন্য দু'টি গানের রচয়িতা প্রেমেন্দ্র মিত্র। 'আখড়াইয়ের দীঘি'-র রূপান্তর 'দ্বীপান্তরে' তারাচরণের কণ্ঠে কয়েকটি গান আছে। তারাচরণ নাটকে কবিয়াল বলেই তার কণ্ঠে গানগুলি মানানসই হয়েছে। তারাচরণের স্ত্রী জয়া ও তার সখীদের কণ্ঠে একটি ভাঁজোর গান আছে। 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা' নাটকে যে গানগুলি আছে সেগুলি গল্পেও ছিল।

৫। পরিণতিতে পরিবর্তন —

রবীন্দ্রনাথের কোনো গল্প যখন তাঁর হাতে নাটকে রূপান্তরিত হয়েছে তখন কোনো কোনো সময় পরিণতিতেও পরিবর্তন ঘটেছে। 'মুকুট' গল্প ও

নাটকের মধ্যে পটভূমিকা ও কাহিনী-বিন্যাসে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। তবে "গল্প যেখানে শুধুই ট্র্যাজেডি, নাটকটি সেখানে নাটকীয় কারণেই মিলনাত্মক।"[৪] রাজধরের প্রতিহিংসা ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য নাটকে কয়েকটি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। নাটকের পরিণতি ভিন্ন ধরনের। রাজধরের সেখানে পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিণতি বিশ্বাস্য হ'য়ে ওঠেনি। 'শেষের রাত্রি' গল্প ও 'গৃহপ্রবেশ' নাটক— দুটোর শেষে একইভাবে মণির ফিরে আসা। কিন্তু গল্পের শেষে মণির ফিরে আসা নিয়ে কিছুটা অস্পষ্টতা থেকে যায়। কিন্তু নাটকের শেষে এই অস্পষ্টতা দূরীভূত। 'একটি আষাঢ়ে গল্পে'-র হরতনের বিবির সঙ্গে রাজপুত্রের প্রেম ও পরিণয়ের মধ্য দিয়ে যে মধুর সমাপ্তি ঘটেছিল 'তাসের দেশ' নৃত্যনাট্যে তাসরাজ্যের প্রজাদের দলবদ্ধ মুক্তির মধ্য দিয়ে যে সমাপ্তি ঘটেছে তাতে সেই মাধুর্য অবলিত।

রবীন্দ্রনাথের মতো তারাশংকরও অনেক সময় গল্পকে নাটকে রূপান্তরিত করতে গিয়ে পরিণতিতে রূপান্তর সাধন করেছেন। 'নুটু মোক্তারের সওয়াল' গল্পের পরিণতি ছিল সংকেতগর্ভ। যে ধনী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নুটুবিহারী আজীবন সংগ্রাম করেছেন শেষ পর্যন্ত তিনি সেই সম্প্রদায়ভুক্তই হলেন। নুটুবিহারীর এই পতনেই গল্পের সমাপ্তি। নাটক বলেই 'দুই পুরুষে'র পরিণতি এমন ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ নয়। গল্প শেষ হয়েছিল নুটুবিহারীর পতনে, নাটকের সমাপ্তি ঘটল তাঁর উত্থানে। বিদ্রোহী পুত্রকে আশীর্বাদ ক'রে, নতুন কালকে স্বাগত জানিয়ে, পত্নী বিমলাকে সর্বস্ব সমর্পণ ক'রে নুটুবিহারীর মুক্তি ঘটল। নাটকের এই পরিণতি মেজাজের দিক থেকে গল্পের পরিণতি থেকে ভিন্ন।

'পিতা-পুত্র' গল্পটির সঙ্গে 'সংঘাত' নাটকের পার্থক্য অনেকটাই। সেই পার্থক্যও অনেকটাই পরিণতিতেও। পুত্র শশিশেখরকে হারিয়ে চরণ

হতাশায় আচ্ছন্ন ন্যায়রত্নের ছবি তুলে ধ'রে গল্পটি শেষ হয়েছে। নাটকের পরিণতি মিলনাত্ত। ন্যায়রত্ন সেখানে পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি ও নাতবৌকে নিয়ে সুখের সংসারে অধিষ্ঠিত। ন্যায়রত্ন চরিত্রের পরিবর্তনও ঘটেছে সেখানে। 'আখড়াইয়ের দীঘি' গল্পটির পরিণতি ঘটেছে পুত্রহন্তা কালীচরণের আত্মহত্যায়। গল্পটির ছায়াবলম্বনে রচিত 'দীপান্তরে'-র পরিণতি ঘটেছে অত্যাচারী, পাপী জমিদার ধনদাপ্রসাদের মৃত্যুতে আর তার মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে পুত্রহন্তা কালীচরণের শান্তির মন্ত্রোচ্চারণে। গল্পের পরিণতিতে যে স্বাভাবিকতা ছিল নাটকে বিবিধ অতিনাটকীয় ঘটনা ও পরিস্থিতির সংযোজনে সেই স্বাভাবিকতা অনেকাংশে বিঘ্নিত হয়েছে।

৬। যে গল্পগুলিকে রবীন্দ্রনাথ ও তারাশংকর নাটকে রূপান্তরিত করার জন্য বেছে নিয়েছিলেন তাদের অধিকাংশই সংলাপপ্রধান ও বর্ণনাবর্জিত। ফলে তাদের নাটকে রূপান্তরিত করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছে। 'শেষের রাত্রি' গল্পের অনেক সংলাপ ভেঙে, বিস্তারিত ক'রে, রূপান্তরিত ক'রে 'গৃহপ্রবেশ' নাটকে ব্যবহার করা হয়েছে। অধিকাংশ সংলাপ সম্পূর্ণ নূতন রচনা। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে গল্পের সংলাপ প্রায় অবিকৃতভাবে নাটকে ব্যবহার করা হয়েছে। বহু ক্ষেত্রেই গল্পের সংলাপকে বিস্তারিত করা হয়েছে পূর্ণাঙ্গ নাটকের প্রয়োজনে। 'কর্মফল' গল্পটিকে যখন 'শোধবোধ' নাটকে রূপান্তরিত করা হ'ল তখনও গল্পের সংলাপ নাটকে অনেক ক্ষেত্রে প্রায় অবিকৃতভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। 'মুক্তির উপায়' গল্পটিকে যখন সাতচল্লিশ বছর পর নাট্যরূপ দেওয়া হ'ল তখন তাতে পুষ্পমালা নামে এক নব্যশিক্ষিতা, বাক্‌পটিয়সী, আধুনিকাকে আনা হল। পুষ্পের কথা নাটকে নূতন সংযোজন। তার কথার প্রভাবে অন্যদের কথায়ও এসেছে 'একধরনের কৃত্রিম আর্টনেসের ছোঁয়া'।[৫]

তারাশংকরও কোনো কোনো ক্ষেত্রে গল্পের সংলাপ নাটকে হুবহু অনুসরণ করেছেন। যেমন 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা' গল্পটির সংলাপ নাটকে প্রায় সম্পূর্ণই ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যত্র, অর্থাৎ 'দুই পুরুষ', 'সংঘাত' ও 'দ্বীপান্তরে' কখনো কখনো গল্পের সংলাপ হুবহু ব্যবহৃত হ'লেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নূতন সংলাপ সংযোজিত হয়েছে অথবা গল্পের সংলাপ বিস্তারিত ও রূপান্তরিত হয়েছে। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও তারাশংকর — দু'জনই প্রায় একই প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছেন।

৭। 'শেষের রাত্রি' যখন 'গৃহপ্রবেশে' রূপান্তরিত হ'ল তখন থীমের দিক থেকেও খানিকটা পরিবর্তন ঘটল যার প্রমাণ নামকরণে ও পরিণতিতে ব্যঞ্জিত। গল্পে মণির প্রত্যাবর্তন আভাসিত, নাটকে স্পষ্ট। 'শেষের রাত্রি' নামে মৃত্যুকেই চূড়ান্ত করা হয়েছে, 'গৃহপ্রবেশে' 'মৃত্যু যে শেষের রাত্রি নয়, সে যে মহত্তর গৃহপ্রবেশের ভূমিকা তারও ইঙ্গিত করা হয়েছে।'[৬] 'একটি আষাঢ়ে গল্প' যখন রূপান্তরিত হ'ল 'তাসের দেশ' নৃত্যনাট্যে তাতে প্রাণ-বন্দনার মাত্রা যুক্ত হ'ল। তাসরাজ্যের প্রজাসাধারণের দলবদ্ধ মুক্তির প্রসঙ্গও নয়া সংযোজন। 'মুক্তির উপায়' নাটকেও বহু সমকালীন বিষয়ের উল্লেখ আছে যা মূল গল্পে ছিল না।

তারাশংকরের 'নুটু মোক্তারের সওয়াল' গল্পটি গড়ে উঠেছিল অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে নুটু মোক্তারের সংগ্রামকে কেন্দ্র ক'রে। 'দুই পুরুষ' নাটকে নূতন সংযোজন পিতাপুত্রের বিরোধ তথা প্রাচীন কালের সঙ্গে নবীন কালের দ্বন্দ্ব। থীমের দিক থেকে নাটকটি গল্প থেকে অনেকটা সরে এসেছে। 'পিতা-পুত্র' গল্পে কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল দুই পুরুষের দ্বন্দ্ব। কিন্তু 'সংঘাত' নাটকে এই দ্বন্দ্ব থাকলেও পরে তা রূপান্তরিত হয়েছে সতী-প্রণামী দ্বন্দ্বে।

নাটকে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের উপাদান যুক্ত হয়েছে যার ইঙ্গিত গল্পে ছিল না। পুত্রহন্তা পিতার অপঘাত মৃত্যুকে কেন্দ্র ক'রে লিখিত হয়েছিল 'আখড়াইয়ের দীঘি' গল্পটি। 'দ্বীপান্তর' নাটকে এর সঙ্গে যুক্ত হ'ল জমিদার-প্রজার দ্বন্দ্ব, জন্ম-রহস্য ইত্যাদি বিষয়। ফলে থীমের দিক থেকে নাটকে বেশ কিছুটা পরিবর্তন ঘটল।

এইভাবে দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথ ও তারাশংকর — দু'জনই গল্পকে নাটকে রূপান্তরিত করার সময় থীমের দিক দিয়েও পরিবর্তন-সাধন করেছেন।

(তিন)

'ললাটের লিখন' রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসোপম বড় গল্প।[৭] গল্পটি রচনার খবর পাওয়া যায় ১৯৩৩ সালের ১৮ এপ্রিল নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লেখা চিঠিতে।[৮] লেখা শেষ হ'লে কবি শান্তিনিকেতনের আশ্রমবাসীদের গল্পটি পড়ে শুনিয়েছিলেন। এরপরই 'ফরমাস এসেচে ওটাকে চালাই করতে হবে নাট্যে'[৯]। সেই নাট্যরূপই 'বাঁশরি' (১৯৩৩)।

গল্পের চরিত্রগুলির নাম নাটকে পরিবর্তিত হয়েছে। গল্পে লেখকের নাম ছিল পৃথ্বীশ, নাটকে ফিতিশ; গল্পে সুষমার গুরুর নাম মুক্তারামবাবু, নাটকে পুরন্দর। পৃথ্বীশকে নিয়ে আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে কবির মত গল্পে কিছুটা প্রকাশিত হয়েছিল। নাটকে বিষয়টি অনেকটা বিস্তারিত হয়েছে। বাঁশরির সংলাপে ধরা দিয়েছে আধুনিক সাহিত্য বিষয়ে কবির মত। যেমন এই 'খেলো আধুনিকতা'র বৈশিষ্ট্য 'সস্তায় পাঠক ভোলাবার লোভ'। এই আধুনিক সাহিত্যে থাকে 'স্কাদগে রঙ'। আর এই 'রঙের আমদানি সমুদ্রের ওপার থেকে।'

গল্পের বর্ণনাকে লেখক অনেক সময় নাট্যনির্দেশে রূপান্তরিত করেছেন। যেমন, নাটকে যখন 'রাজাবাহাদুর সোমশংকরের প্রবেশ তখন' রাজার 'শালপ্রাংশু—মহাভুজ' রাঘবংশিক চেহারার বর্ণনা গল্পের বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। জয়দেব-পদ্মাবতীকে নিয়ে পৃথ্বীশের গল্পের বিবরণ, স্ত্রী-পুরুষের দ্বৈততত্ত্ব নিয়ে পৃথ্বীশ-বাঁশরি আলোচনা নাটকে দর্শক জানে বন্ধুদের সঙ্গে লীলার সংলাপে। 'রক্তজবা' বইটি লিখেছিল পৃথ্বীশের প্রতিদ্বন্দ্বী যতীন ঘটক। বইটি পৃথ্বীশের লেখা মনে ক'রে তার প্রশংসা ক'রে গল্পে বিবৃত হয়েছিল সোমশংকর। নাটকে এজন্যে ফিতীশের কাছে বিবৃত হয়েছে লীলা। 'বেমানান' গল্পের সারসংক্ষেপ বাদ পড়েছে নাটকে স্বাভাবিক কারণেই। নাটকের অনেক ক্ষেত্রেই গল্পের সংলাপ বিনা পরিবর্তনে বা সামান্যতম পরিবর্তনে ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য নূতন অনেক সংলাপও রচিত হয়েছে।

'ললাটের লিখন' গল্পের শেষটা ছোটগল্পের লক্ষণাক্রান্ত। বাঁশরি পৃথ্বীশকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল। কিন্তু সোমশংকর জানাল যে সন্ন্যাসীর কাছে ব্রতের জন্যে সে বিয়ে করছে সুষমাকে, সেই ব্রত বাঁশরির প্রতি তার ভালোবাসা থেকে বড়। ভালোবাসা রয়ে গেল বাঁশরির জন্যে যার স্মারক জল থেকে তুলে আনা গয়নাগুলি। গল্পের 'পরিশিষ্টে' বলা হল—'পৃথ্বীশ একখানা চিঠি পেলে'। এই চিঠি যে বিয়ে ভেঙে দেবার চিঠি তা গল্পে পরিষ্কার নয়। কিন্তু এই চিঠির ফলেই পৃথ্বীশ 'চলে গেল সব কাজ থেকে ছুটি নিয়ে ডেরাদুনে, একটা নিষ্ঠুর গল্প লেখবার জন্য।' পূজনীয়ের চরিত্রে কালিমা লেপন ক'রে পৃথ্বীশের প্রতিশোধ নেবার উদ্যোগ থেকে বাঁশরির চিঠির অর্থ বোঝা যায়। নাটকে সোমশংকর তার ভালোবাসার কথা বাঁশরিকে জানালে সুষমার প্রতি বাঁশরির ঈর্ষা লুপ্ত হয়। সে লীলার মাধ্যমে চিঠি পাঠিয়ে ফিতীশের সঙ্গে তার 'বিবাহের আসন্ন আশঙ্কাটা সম্পূর্ণ লোপ করে।' গল্প যেখানে শেষ হয়, নাটক সেখানে থামে না। পুরন্দরের সঙ্গে বাঁশরির

সংলাপ নূতন সংযোজন। সোমশংকর সুষমার ব্রতে বাধা দেবে না বলে কথা দেয়। প্রকৃতিরূপিণী বাঁশরির প্রতিশ্রুতিতে পুরন্দর নিশ্চিন্ত হয়। বাঁশরি পুরন্দরকে প্রণাম করে। এই প্রণাম বাঁশরির চরিত্রের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়।

(চার)

'বউঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩) উপন্যাসটির বিচিত্র নাট্যরূপান্তরের ইতিহাস আছে। উপন্যাস থেকে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক (১৯০৯), তা থেকে এক প্রকারের রূপান্তর 'মুক্তধারা' (১৩২৯), অন্য প্রকারের রূপান্তর 'পরিত্রাণ' (১৯২৭)। উপন্যাসের প্রতাপ জড়তা ও নিষ্ঠুরতার প্রতিভূ, সে ইতিহাসের স্বদেশপ্রেমী বীর প্রতাপ নয়। এই প্রতাপের পারিবারিক জীবন নিয়ে গড়ে উঠেছিল উপন্যাসটি। উপন্যাসের প্রাথমিক নাট্যরূপ 'প্রায়শ্চিত্ত' সম্পর্কে কবি বলেছেন, "মূল উপন্যাসখানির অনেক পরিবর্তন হওয়াতে এই নাটকটি প্রায় নূতন গ্রন্থের মতোই হইয়াছে।"[১০] তবে বহু ক্ষেত্রেই উপন্যাসের পরিচ্ছেদগুলি প্রায় অবিকল নাটকের দৃশ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। কখনো দুই বা ততোধিক পরিচ্ছেদকে একটি দৃশ্যে সংহত করা হয়েছে।

উপন্যাসের রুক্মিণী চরিত্র নাটকে পরিত্যক্ত। নাটকে নবাগত চরিত্র ধনঞ্জয় বৈরাগী। চরিত্রটির উৎস সম্পর্কে প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন,—"১৯০৫-০৬ সালের বঙ্গবিপ্লবের বহ্নিশিখা থেকেই ..... ধনঞ্জয় বৈরাগীর চারিত্র্যশক্তির উদ্ভব"।[১১] 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের পরবর্তী নাট্যরূপান্তরের ইতিহাসে এই চরিত্রটি বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই প্রভাবের মূল ১৯০৫ - উত্তর জাতীয় আন্দোলনের পটভূমি। উপন্যাসের ঘটনারাজি প্রতাপের পারিবারিক জীবনকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছিল। ফলে কাহিনীর গঠনে ঐক্য ছিল। কিন্তু ধনঞ্জয় বৈরাগীর

112048
13 APR 1995
NORTH BENGAL
University Library
Raja Rammohunpur

উপস্থিতিতে ঐ ঐক্য বিনষ্ট হয়েছে। প্রজাদের সঙ্গে উদয়াদিত্যের ঘনিষ্ট সম্পর্ক নাটকের নূতন উপাদান। ধনঞ্জয় বৈরাগীর সঙ্গে নাটকে এসেছে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে প্রজাবিদ্রোহের সম্পূর্ণ নূতন উপকরণ। ধনঞ্জয় বৈরাগী এই প্রজাবিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছে। আবার-প্রতাপের সঙ্গে ধনঞ্জয়ের বিরোধ শুধু ব্যক্তিগত বিরোধ নয়, আদর্শগত বিরোধ। এই আদর্শগত বিরোধের সঙ্গে প্রতাপের পারিবারিক কাহিনী সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় নি। উপন্যাসে বসন্ত রায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কিন্তু নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর আবির্ভাবে এবং বৈরাগীর সঙ্গে চারিত্রিক কোন কোন বৈশিষ্ট্যে সাদৃশ্য থাকার জন্য বসন্ত রায় চরিত্র গুরুত্ব হারিয়েছে। উপন্যাসে উদয়াদিত্যের অঙ্গুরী নিয়ে জাল দরখাস্ত বানিয়ে উদয়কে জড়ানো হয়েছিল। কিন্তু নাটকে প্রতাপের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ প্রজারা উদয়কে রাজা করতে দিল্লীতে দরখাস্ত পাঠিয়েছে। তাই জাল দরখাস্ত নিয়ে ষড়যন্ত্রের আর প্রয়োজন হয় নি। বিভা সম্পর্কে রামমোহনের ভ্রান্তি উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছিল, নাটকে তার ছায়ামাত্র নেই।

উপন্যাসের শেষে উদয়াদিত্যের সঙ্গে বিভার কাশীবাসের সংবাদ আছে। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের শেষেও এ সংবাদ আছে। তবে নাটকে বিভা মুক্তি পেয়েছে। উপন্যাস শেষ হয়েছিল এক সর্বব্যাপী হতাশায়। নাটকে মুখ্য হ'য়ে উঠেছে এক সর্বব্যাপী আনন্দবাদ, যার প্রবক্তা ধনঞ্জয় বৈরাগী। সব কালিমা ঐ আনন্দে অবলুপ্ত। 'প্রায়শ্চিত্তে'-র পরবর্তী রূপান্তর 'পরিত্রাণে'-র সমাপ্তিও একই ধরনের। এর অবশ্য কোনো শিল্পগত কারণ নেই। উপন্যাসে গান ছিল। অধিকাংশই বসন্ত রায়ের কণ্ঠে। 'প্রায়শ্চিত্তে' গানের সংখ্যা বহুগুণ বেড়েছে। অধিকাংশই ধনঞ্জয় বৈরাগীর কণ্ঠে। উপন্যাসে শুধু বর্ণনাংশে নয়, সংলাপেও সাধু ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু 'প্রায়শ্চিত্তে' নাটকীয় প্রয়োজনে সংলাপে স্বাভাবিক কারণেই চলিত ক্রিয়া প্রযুক্ত হয়েছে।

(পাঁচ)

'রাজর্ষি' (১৮৮৭) উপন্যাসের প্রথমাংশকে রবীন্দ্রনাথ রূপান্তরিত করেছিলেন 'বিসর্জন' নাটকে (১৮৯০)। উপন্যাসের পরবর্তী অংশের সুজা ইত্যাদির কাহিনী নাটকে নেই। 'রাজর্ষি'-র সূচনায় রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন যে উপন্যাসের প্রেরণাস্বরূপ স্বপ্নলব্ধ কাহিনীটির আসল গল্পটা ছিল 'প্রেমের অহিংস পূজার সঙ্গে হিংস্র শক্তিপূজার বিরোধ'। মাসিক পত্রের দাবিতে এই গল্পটি অকারণে বেড়েছিল।

'বিসর্জনে' নাট্যকাহিনী জমাট ঐক্য ও সংহতি লাভ করেছে যা উপন্যাসের কাহিনীতে ছিল অনুপস্থিত। উপন্যাসে রঘুপতিকে দীর্ঘদিনের জন্যে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। নাটকে নির্বাসনদন্ড পাওয়ার পর শ্রাবণের শেষ দু'দিন সময় চেয়ে নিয়েছে রঘুপতি এবং এই দু'দিনে ব্যাপ্ত তীব্র গতিশীল ঘটনারাজিকে নাটকে রূপ দেওয়া হয়েছে। শ্রাবণের শেষ রাতে জয়সিংহ তার অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে চিরদিনের জন্য মুক্তি পেয়েছে তার আত্মবিসর্জনের মাধ্যমে। জয়সিংহের আত্মত্যাগ রঘুপতির হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। অথচ 'রাজর্ষি'-তে এজন্য জয়সিংহের আত্মদান ছাড়াও দীর্ঘ সময় ও বিনুনের প্রভাবের দরকার ছিল। উপন্যাসে জয়সিংহের মৃত্যুর পরও রঘুপতি গোবিন্দমাণিক্যের বিরোধিতা করেছে, কিন্তু নাটকে জয়সিংহের আত্মদান দ্রুত রঘুপতির হৃদয়ে পরিবর্তন ঘটিয়েছে। মিথ্যা ও ছলনার আশ্রয় নিয়ে উপন্যাসের রঘুপতি ছোট হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু নাটকের শেষে জয়সিংহের আত্মবলিদানের মর্মান্তিক বেদনায় পীড়িত হ'য়ে রঘুপতি তার লুপ্ত মহিমা কিছুটা ফিরে পেয়েছে। 'রাজর্ষি'-তে গোবিন্দমাণিক্যের গুরুত্ব ছিল বেশি, উপন্যাসের নামেও ঋষিকল্প রাজা গোবিন্দমাণিক্য সংকেতিত। কিন্তু 'বিসর্জনে' জয়সিংহের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও শেষে আত্মবিসর্জন প্রাধান্য পাওয়ায় জয়সিংহই প্রধান চরিত্র হ'য়ে উঠেছে। উপন্যাসের পার্শ্বচরিত্র জয়সিংহ নাটকে নায়কের মর্যাদা পেয়েছে।

গুণবতীর বন্ধ্যাজীবনের বেদনা এবং রাজা ও রাণীর সম্পর্কও নাটকের নবাগত বিষয়, যার ছায়ামাত্র উপন্যাসে ছিল না। তেমনি অপর্ণা-সংক্রান্ত বিষয়ও নাটকে নবাগত। অপর্ণার প্রেম জয়সিংহকে বিবেকসংগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করেছে। জয়সিংহের প্রেম নাটকের নূতন বিষয়। জয়সিংহের অন্তর্দ্বন্দ্ব উপন্যাসেও ছিল। কিন্তু নাটকে তা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ধ্রুবকে হত্যার চিন্তা উপন্যাসে প্রথমে করেছিল রঘুপতি, নাটকে গুণবতী। উপন্যাসে ধ্রুবকে হত্যার চেষ্টা জয়সিংহের আত্মদানের পরে ঘটেছে। নাটকে জয়সিংহের আত্মদানের আগে ধ্রুবের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ রঘুপতির পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। মন্দিরে হত্যার জন্য আনীত ধ্রুবর মুখের দিকে তাকিয়ে রঘুপতির মনে পড়ে গিয়েছিল জয়সিংহের শৈশবের কথা। রঘুপতির কঠিন হৃদয় সেই প্রথম কোমল হয়েছিল।

'রাজর্ষি' থেকে 'বিসর্জনে' ভাষাগত রূপান্তর সাধিত হয়েছে। 'রাজর্ষি' ও 'বিসর্জন'— উভয় ক্ষেত্রেই প্রজাদের সংলাপে অথবা প্রজাদের সঙ্গে অন্য চরিত্রদের সংলাপে গদ্য ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু প্রধান চরিত্রদের কথোপকথন 'রাজর্ষি'-তে আছে গদ্যে আর 'বিসর্জনে' অমিত্রাক্ষরে। এই রূপান্তরে ভাষা অধিকতর সংহতি ও ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। 'বিসর্জনে'-র পদ্য-সংলাপে অনুভূতির উচ্চতম স্তর ও দৈনন্দিনের সাধারণ স্তর — উভয়ই বিধৃত হয়েছে।

(ছয়)

'প্রজাপতির নির্বন্ধ' (১৯০৮) উপন্যাসকে রবীন্দ্রনাথ 'চিরকুমার সভা' প্রহসনে (১৯২৬) রূপান্তরিত করেছিলেন। প্রথমে উপন্যাসটির নামই ছিল 'চিরকুমার সভা'। পরে কবি নূতন নাম দিলেন 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'। উপন্যাসটি পুরোদস্তুর উপন্যাস ছিল না, ছিল আধা-উপন্যাস, আধা-নাটক। সংলাপবহুল, বর্ণনাবিরল এই রচনাকে নাট্যরূপদান কঠিন ছিল না। উপন্যাসটি নির্মিত হয়েছিল সংলাপের

সঙ্গে সংলাপ যুক্ত ক'রে। এর পরিচ্ছেদগুলি নাটকের দৃশ্যের মতো সাজানো। নাটকের মতোই পাত্রপাত্রীর প্রবেশ-প্রস্থান ইত্যাদি নির্দেশিত হয়েছে। ফলে নাটকে রূপান্তরের ক্ষেত্রে নাট্যকারের কোনো অসুবিধেই হয় নি। গানের ওস্তাদ গুরুদাস নাটকে একমাত্র নূতন প্রসঙ্গ, যদিও এর উল্লেখ মূল রচনায় ছিল। দু'একটি গান নাটকে নয়া সংযোজন।

'প্রজাপতির নির্বন্ধ'-কে পুরোদস্তুর নাটকে রূপান্তরিত করা যায়নি, কারণ ভিতরে-ভিতরে উপন্যাসের উত্তরাধিকার রয়ে গিয়ে নাটকীয়তার ক্ষতি করেছে। ফলে এই নাট্য-রূপান্তর শিল্প-সফল হয় নি। এ প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য : "মূলে গল্পাকারে লিখিত হইয়াছিল বলিয়াই নাট্যরূপের মধ্যেও গল্প-শিল্পের প্রকৃতি রহিয়া গিয়াছে ; ইহাকে অভিনয়যোগ্যতা দিতে গিয়াও কবি সম্পূর্ণভাবে কৃতকার্য হন নাই। উপন্যাসের ঘটনার মৌলিক মনোহরতা, ঔপন্যাসিক সংলাপের দীর্ঘায়ত আতিশয্য নাটকের অনিবার্য গতিকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে।"[১২]

(সাত)

শিশিরকুমার ভাদুড়ির অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ 'যোগাযোগ' উপন্যাসের (১৩৩৬) নাট্যরূপ দিয়েছিলেন।[১৩] শিশিরকুমারের প্রযোজনা ও পরিচালনায় নবনাট্যমন্দিরে 'যোগাযোগ' নাটক প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৩৬ সালের ২৪ ডিসেম্বর। 'যোগাযোগ' উপন্যাসটিকে নাটকে রূপান্তরিত করার মূলে ছিল নটরাজ শিশিরকুমারের আগ্রহ। অনুমান করা যায় যে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রথমে যোগাযোগের নাট্যরূপ দেন। পরে কবি তাকে সংশোধিত ও পরিমার্জিত করেন। সেইটি নিয়েই শিশিরকুমার 'যোগাযোগে'-র অভিনয়-কপি তৈরী করেন।

উপন্যাসের কোনো কোনো অংশ নাটকে বর্জিত হয়েছে। এই বর্জন নাটকের পক্ষে ক্ষতিকারক হয় নি। কিন্তু বিপ্রদাস-কুমুর জনক-জননী মুকুন্দলাল-নন্দরাণীর দাম্পত্য-জীবনের কাহিনী বর্জিত হওয়ায় নাটকের ক্ষতি হয়েছে। কারণ কুমু-মধুসূদনের দাম্পত্য-জীবনের জটিলতাকে উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে কুমুর পিতামাতার জটিল দাম্পত্য-সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে। উপন্যাসে কুমুর মা নন্দরাণী সংসার ত্যাগ করেছিলেন যেদিন তিনি সংসারে তাঁর মর্যাদার আসন হারিয়েছিলেন। উপন্যাসে কুমু মায়ের দৃষ্টান্ত তুলে বলেছিল, যেদিন সে মুক্তি চাইবে, সেদিন কিছুই তাকে ঠেকাতে পারবে না, এমনকি তার গর্ভের সন্তানও নয়। নাটকে কুমু মায়ের দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পারে না। ফলে কুমুর স্বাধীনতা-বোধের মূলে নিহিত থাকে শুধু বিপ্রদাসের প্রবর্তনা।

'যোগাযোগ' উপন্যাসের সম্পদ বর্ণনার অনুপম সৌন্দর্য, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, সূক্ষ্ম সংবেদনশীল বর্ণনা। এগুলি চরিত্রের আবরণকে ধীরে ধীরে উন্মোচিত করে। নাটকে স্বভাবতই এগুলি বর্জিত হয়েছে। এই বর্জন চরিত্রের অন্তর্নিহিত জটিলতাকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়েছে। কিন্তু নাট্যকার ছিলেন অনন্যোপায়। যেমন পিত্রালয়ে ফিরে এসে বিবাহিতা কুমুর মনে হয়েছে—

"ঝাকগুলো ডাকাডাকি করছে, বাইরের রাস্তায় গাড়ির শব্দ আর লোকালয়ের নানা কলরব। নূতন বসন্তের হাওয়া শহরের ইঁটকাঠের উপর রঙ ধরাতে পারলে না। সামনের বাড়িটাকে অনেকখানি আড়াল করে একটা পাতাবাদামের গাছ, অস্থির হাওয়া তারই ঘনসবুজ পাতায় দোল লাগিয়ে অপরাহ্নের আলোটাকে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিতে লাগল। এইরকম সময়েই পোষা হরিণী তার অজানা বনের দিকে ছুটে যেতে চায়, যেদিন হাওয়ার মধ্যে বসন্তের ছোঁওয়া লাগে, মনে হয় পৃথিবী যেন উৎসুক হয়ে চেয়ে আছে নীল আকাশের দূর পথের

দিকে। যা-কিছু চার দিকে বেড়ে আছে সেইটেকেই মনে হয় মিথ্যে, আর যার ঠিকানা পাওয়া যায় নি, যার ছবি আঁকতে গেলে রঙ যায় আকাশে ছড়িয়ে, মূর্তি উঁকি দিয়ে পালিয়ে যায় জলস্থলের নানা ইশারার মধ্যে, মন তাকেই বলে সব চেয়ে সত্য। কুমুর মন হাঁপিয়ে উঠে আজ পালাই-পালাই করছে সব-কিছু থেকে, আপনার কাছ থেকে।"— এরকম অনুপম বর্ণনা উপন্যাসের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

'যোগাযোগ' উপন্যাসের সর্বাঙ্গে এক সাঙ্গীতিক বিন্যাস চোখে পড়ে। যেমন —

> "(কুমু) এসরাজের সুর বাঁধলে। কেদারায় আলাপ আরম্ভ করলে; ভুলে গেল ঘরে কেউ আছে, কেদারা থেকে পৌঁছোল ছায়ানটে। যে গানটি সে ভালোবাসে সেইটি ধরল, ...। সুরের আকাশে রঙিন ছায়া ফেলে এল সেই অপরূপ আবির্ভাব, যাকে কুমু গানে পেয়েছে, প্রাণে পেয়েছে, কেবল চোখে পাবার তৃষ্ণা নিয়ে যার জন্যে মিনতি চিরদিন রয়ে গেল .....। মধুসূদন সংগীতের রস বোঝে না, কিন্তু কুমুর বিশ্ববিস্মৃত মুখের উপর যে সুর খেলছিল, এসরাজের পর্দায় পর্দায় কুমুর আঙুল-ছোঁয়ার যে ছন্দ নেচে উঠছিল তাই তার বুকে দোল দিলে, মনে হতে লাগল ওকে যেন কে বরদান করছে।"

নাটকে ছ'টি গান প্রয়োগ ক'রেও এই সাঙ্গীতিক বিন্যাস আনা যায় নি।

"উপন্যাসে কুমুর আত্মনিবেদন ও আত্মপ্রকাশের গানগুলি সমস্ত বিষয়টিকে এক অসামান্য সূক্ষ্মতার স্তরে প্রতিষ্ঠিত করে।"[১৪] এই সূক্ষ্মতা নাটকে অনুপস্থিত।

'যোগাযোগ' উপন্যাস ও নাটকের মধ্যে কালগত ব্যবধান সাত বছরের। ফলে নাটকে সমাজ-সম্পর্কিত অনেক বক্তব্য তীব্রতরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। জমিদারি ব্যবস্থার অন্যায়ের দিক স্পষ্টতর হয়েছে নাটকে বিপ্রদাসের কথায়। নারীর স্বাতন্ত্র্যবোধ ও আত্মসম্মানবোধের বিষয়টি স্পষ্টতর হয়েছে কুমুর কথায়।

'যোগাযোগ' নাটকের সমাপ্তির সঙ্গে উপন্যাসের সমাপ্তি মেলে না। এই অমিলের পেছনে শিশিরকুমারের কিছুটা প্রভাব সক্রিয় ছিল। উপন্যাস - শেষে কুমুকে নেবার জন্য পালকি নিয়ে লোকজন এসেছিল। কিন্তু মধুসূদন আসে নি। কুমু পিতৃগৃহে যাত্রা করলে একান্ত শূন্যতার মধ্যে বসে থাকে বিপ্রদাস। নাটকে মধুসূদন স্বয়ং কুমুকে নিতে আসে। কুমুর গর্ভে তখন মধুসূদনের সন্তান। কুমু মধুসূদনের ঘরে যেতে রাজি হয়। কারণ সে বুঝেছে এখন সে মুক্ত ('মনের মধ্যে বেড়ি খসেছে, তাই যাচ্ছি, নইলে যেতাম না')। মধুসূদনকে সে বলে, 'চলো, তবে যাই আমাদের ঘরে।' হয়তো বংশধরের আবির্ভাবের সম্ভাবনায় মধুসূদনের মনেরও পরিবর্তন ঘটে। বিপ্রদাসকে প্রণাম ক'রে সে আশীর্বাদ চায়। তবু কুমু ও মধুসূদনের এবম্বিধ পরিবর্তন মেনে নিতে মন সায় দেয় না।

'মালঞ্চ' উপন্যাসের রচনাকাল ১৯৩৩-এর প্রথম ভাগ, গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল ১৯৩৪-এর মার্চ মাস। ১লা ভাদ্র, ১৩৪০ সালে নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন — "তারপরে মালঞ্চের নাট্যকরণে কোমর বাঁধতে হোলো। কারণ কোমরের প্রতিবেশী জঠরের তাগিদ ছিল। অথচ অভিনয় হতে পারবে বলে আশা নেই।"[১৫] হয়তো এই চিঠি লেখার আগেই মালঞ্চের নাট্যরূপান্তর শেষ হয়েছিল। যদি তা-ই হ'য়ে থাকে তবে ধরে নেওয়া যায় যে উপন্যাস ও নাট্যরূপের মধ্যে সময়গত ব্যবধান খুব বেশি নেই।

'মালঞ্চ' উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের সঙ্গে 'মালঞ্চ' নাটকের মূল পাণ্ডুলিপি (যা রবীন্দ্র-ভবনে রক্ষিত ছিল, বর্তমানে 'রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা' দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত) মেলালে কিছু ছোটখাট অমিল চোখে পড়ে। এই অমিলগুলি গুরুতর নয়। আর এগুলির মূলে ছিল নিছক নাটকীয় প্রয়োজন। তাছাড়া 'মালঞ্চ' উপন্যাসটিই ছিল সংলাপ-প্রধান। ফলে তাকে নাট্যরূপদানে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অসুবিধে হয় নি। সুধীরচন্দ্র কর লিখেছেন: "মালঞ্চ উপন্যাসখানিকে নাট্যাকারে পরিবর্তিত ক'রে শান্তিনিকেতনে একবার অভিনয় করবার কথা হয়। এমনিতেই সমস্ত বইটা কথাবার্তায় ভরানো। অধ্যায়গুলোকে দৃশ্য করে বর্ণনার অংশগুলোকে প্রয়োজনার নির্দেশের মধ্যে ভরে দেওয়া গেল। কথাবার্তার অংশ প্রায় যথাযথই রইল; এই ক'রে তিন-চারখানা এক্সারসাইজ বুকে মালঞ্চের নাট্যরূপ দাঁড় করানো হল।"[১৬] বস্তুত 'মালঞ্চ' উপন্যাস ও 'মালঞ্চ' নাটকের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। এ থেকে বোঝা যায় যে সাহিত্য-জীবনের শেষ পর্যায়ে সাহিত্যশাখাগুলোর মধ্যে ব্যবধান রবীন্দ্রনাথ কমিয়ে আনছিলেন।

১৯৩৬ সালে 'রাজর্ষি' উপন্যাসের শেষাংশ, যে অংশ 'রাজর্ষি' থেকে 'বিসর্জনে' রূপান্তরের সময় গৃহীত হয় নি এবং 'দালিয়া' গল্প অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ এক নাটক রচনার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই নাটক আর লেখা হয়ে ওঠেনি, প্রভাতকুমার গুপ্তের খাতায় পরিকল্পনার ছকটি ছিল।

'কালিন্দী' উপন্যাসটিকে (১৯৪১) তারাশংকর নাট্যরূপ দেন ১৯৪২ সালে। উপন্যাসের অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে সোমেশ্বর ও রামেশ্বরের কাহিনী এবং রায়-ও চক্রবর্তী পরিবারের বিরোধের ইতিহাস। কিন্তু নাটকে সোমেশ্বরের কাহিনী ও দুটি পরিবারের বিরোধের ইতিহাস প্রসঙ্গক্রমে দর্শকদের জানানো হয়েছে মাত্র। নাটকে সংঘবদ্ধ শ্রমিকরা মিল-মালিকের বিরুদ্ধে 'ধর্মঘট' করেছে। অহীন্দ্র তাদের নেতা।

সংঘবদ্ধ, জাগ্রত শ্রমিকশ্রেণীর এই ছবি উপন্যাসে ছিল না। উপন্যাসে সাঁওতালরা অধিকাংশই মিল-মালিকের অত্যাচারে চর ছেড়ে পালিয়েছিল। নাটকে তারা পালায় নি, মিল-মালিকের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। উপন্যাসে রামেশ্বর সন্দেহবশত তাঁর পুত্র ও তাঁর প্রথমা পত্নীকে ঘরের মধ্যে গলা টিপে হত্যা করেন। কিন্তু নাটকে রামেশ্বর তাঁর সন্তানকে ঘরে হত্যা করলেও প্রথমা পত্নী রাধারাণীকে চরে হত্যা করেন।

উপন্যাসের মতো নাটকেও সমান নিষ্ক্রিয় রামেশ্বর। নাটকে তিনি অনেকটাই নেপথ্যচারী। সাঁওতালদের ভূমিকা নাটকে অনেকটাই সংকুচিত। সাঁওতালদের সম্প্রদায়গত পরিচয় উপন্যাসে প্রধান। নাটকে তাদের ব্যক্তিরূপ অনেক বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। বিশেষত উপন্যাসের সারীর তুলনায় নাটকের সারী অনেক বেশি সক্রিয় ও আকর্ষণীয়। বিমাতার হারানো কাঁকন নিয়ে অহীনের আকুলতার চিহ্নমাত্র উপন্যাসে ছিল না। উপন্যাসে মিল-মালিক বিমলবাবুর কাছে সারী স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছিল। নাটকে বিমলবাবু জোর ক'রে সারীকে বশীভূত করেন। উপন্যাসে সাঁওতালরা সারীর স্বামী, কমল মাঝি ও তার স্ত্রীকে একঘরে করে। পরে তারা চর ছেড়ে পালিয়ে যায়। নাটকে সারীর অপমানের প্রতিকারে অহীন কমল ও সারীর প্রেমিক ডগরুর সঙ্গে এগিয়ে যায়। বিমল মুখার্জীর গুলিতে সারীর মৃত্যু হয়। উপন্যাসে কমল ও সারীর স্বামী আর চরে ফেরেনি। সারীরও মৃত্যু ঘটেনি। উপন্যাসে অহীন্দ্র গ্রেপ্তার হয়েছিল রাজদ্রোহের অপরাধে, নাটকে সে গ্রেপ্তার হয় মিল-মালিকের বিরুদ্ধে ধর্মঘটের ষড়যন্ত্র করার অপরাধে। উপন্যাসে অহীন্দ্র বিপ্লববাদী ছিল, নাটকে সে শেষ পর্যন্ত গান্ধীবাদী হ'য়ে উঠেছে। পিস্তল ফেলে দিয়ে সে পুলিশ আর শ্রমিকদের মাঝে দাঁড়িয়ে রক্তপাত প্রতিহত করেছে।

'কালিন্দী' উপন্যাস ও তার নাট্যরূপের পরিণতিতে খানিকটা পার্থক্য দেখা যায়। উপন্যাসে রাজদ্রোহ ও রাজকর্মচারী হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে পুলিশ

অহীন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে। উপন্যাসে অহীন্দ্র বিপ্লববাদী, নাটকে সে গান্ধীবাদী। উভয়ক্ষেত্রেই অহীন্দ্রের গ্রেপ্তার হওয়ার ঘটনা রামেশ্বরকে পাপের স্বীকারোক্তিতে প্রেরিত করেছে। উভয়তই পুত্রদের (মহীন ও অহীন) আত্মদানে পিতার (রামেশ্বর) কাল্পনিক রোগ থেকে মুক্তির বিষয়টি আছে। কিন্তু উপন্যাসের অন্তিমে সুনীতির মাধ্যমে কালিন্দী নদী ও তার চরের মধ্যে ইতিহাসের যে পালাবদলকে লেখক দেখিয়েছিলেন ("কালের ভগ্নী কালিন্দী মহাকালের নির্দেশকে প্রতিফলিত করিয়া চলিতেছে। আগে যেখানে কালিন্দীর জলে আকাশ ও নদীতীরের গাছ-গাছালি তৃণবনের ছায়া ভাসিত, আকাশে ওড়া বকের সারির ছবি ভাসিত — আজ সেখানে কালিন্দীর সেই স্রোতোধারায় উদয় সূর্যের আলোয় আলোকিত কলের চিমনী এবং চিমনীতে ওঠা ধোঁয়ার রাশি একটা অনির্দেশ্য শাসনের মত ভাসিতেছে বলিয়া মনে হইল") , নাটকে তা বর্জিত হয়েছে। ফলে উপন্যাসের পরিণতির মহত্ত্ব ও গভীরতা নাটকের পরিণতিতে নেই। আর উপন্যাসের শেষে ছিল ভয় থেকে সুনীতির চিরকালের মুক্তি-লাভ ("তাঁহার আর ভয় নাই। না। বরঞ্চ চরাচরব্যাপী আলোর মধ্যে যে আশ্চর্য অভয় আছে তাহারই স্পর্শ পাইয়া সুনীতি আশ্বস্ত হইলেন।") নাটকের শেষে এই মুক্তি সুনীতি পান নি, পেয়েছেন রামেশ্বর। উভয়ক্ষেত্রেই অবশ্য ঊষার চিত্রকল্প প্রযুক্ত।

'কালিন্দী' উপন্যাসটি যখন নাটকে রূপান্তরিত হ'ল তখন ধীমেরও পরিবর্তন ঘটল। উপন্যাসে তারাশংকর কৃষকদের জাগরণের গল্প বলেন নি, সাঁওতালদের বিদ্রোহের ছবিও আঁকেন নি। উপন্যাসটি ছিল অনেকাংশে অহীন্দ্রের আত্মবিকাশের বৃত্তান্ত। নাটকে কিন্তু দেখি অহীন্দ্রের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ শ্রমিকরা মিল-মালিকের বিরুদ্ধে 'ধর্মঘট' করেছে। সংঘবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর এই চিত্র নাটকের ধীমে খানিকটা পরিবর্তন এনেছে। তাছাড়া উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছিল বিপ্লববাদ, নাটকে গান্ধীবাদ।

'কালিন্দী' উপন্যাসে গানের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না। একাদশ পরিচ্ছেদে সাঁওতাল-পল্লীর মেয়েদের কণ্ঠে একটি গান ছিল। একবিংশ পরিচ্ছেদে একটি গান ছিল ঐ সাঁওতাল মেয়েদেরই কণ্ঠে। দুটি গানই সাঁওতালি ভাষায় লেখা। গান দুটির সংযোজনায় সাঁওতালপল্লীর বাস্তবসম্মত পরিবেশ রচিত হয়েছে। অন্যদিকে 'কালিন্দী' নাটকের শুরুতে সাঁওতাল মেয়েদের কণ্ঠে একটি গান সংযোজিত হয়েছে — গানটির ভাষা লৌকিক বাংলা। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই সারীর কণ্ঠে একটি গান প্রযুক্ত। প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে উমার কণ্ঠে একটি গান আছে। উপন্যাসে উমা বহু কবিতা আবৃত্তি করেছে, কিন্তু একটিও গান গায় নি।

'কবি' উপন্যাসের (ফাল্গুন, ১৩৪৮) মূল কাহিনী মোটামুটি নাটকে (আষাঢ়, ১৩৬৪) অনুসৃত হয়েছে। তবে কিছু কিছু গৌণ ঘটনায় উপন্যাস ও নাটকে পার্থক্য আছে। উপন্যাসে ঠাকুরঝির কথা ও বসন্তের কথা — কাহিনী দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে। দু'টি অংশের যোগ নিবিড় নয়। নাটকে এই ত্রুটি শুধরে নেওয়া হয়েছে। নাটকের ফাঁকে ফাঁকে ঠাকুরঝির প্রসঙ্গ আনা হয়েছে। উপন্যাসের তুলনায় নাটকে ঠাকুরঝির মস্তিষ্কবিকৃতির কারণটিকে অধিকতর স্পষ্ট করা হয়েছে। ঠাকুরঝির মনোবিকারের খবর পেয়ে রাজন্ ও তার স্ত্রীর ঠাকুরঝির বাড়ী যাওয়া, ওঝার দুর্বোধ্য মন্ত্রোচ্চারণ এবং ঠাকুরঝির ওপর শারীরিক নির্যাতনে রাজনের বাধাদান ইত্যাদি প্রসঙ্গও উপন্যাসে ছিল না। বসনের মৃত্যুতে নিতাইয়ের শোককাতরতার ছবি নাটকে বর্জিত হয়েছে।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র নিতাইয়ের পূর্বজীবনবৃত্তান্ত নাটকে পরিত্যক্ত। উপন্যাসে বসন্তের মৃত্যুর পর নিতাইয়ের কাশীযাত্রা ও সেখানকার অভিজ্ঞতার বিবরণ নাটকে বর্জিত হয়েছে। ঠাকুরঝির শ্বশুরবাড়ীর ঘটনা উপন্যাসে ছিল না, নাটকে আছে। ফলে নাটকে ঠাকুরঝির চরিত্র পূর্ণতা লাভ করেছে। নাটকে

ঠাকুরঝির স্বামী বৃন্দাবন ও শাশুড়ী অনেকটা স্পষ্ট ও সক্রিয়। ঝুমুরদলের চিত্র নাটকে অস্পষ্ট। বসন, মামী, নির্মলা ও ললিতার চরিত্র নাটকে অনেকটা স্পষ্ট রেখায় অঙ্কিত। তবু নাটকে ঝুমুরদলের গোষ্ঠীগত পরিচয় যত স্পষ্ট তাদের ব্যক্তিগত চরিত্র-স্বাতন্ত্র্য তত স্পষ্ট নয়। বসন্তের সঙ্গে নিতাইয়ের সম্পর্কের সব সূত্রগুলি নাটকে নেই। থাকা সম্ভবও ছিল না। উপন্যাসের তুলনায় নাটকে গৌণ চরিত্রগুলি বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন, রাজনের স্ত্রী উপন্যাসের তুলনায় নাটকে একটু বেশি সজীব। রাজনের স্ত্রী ও ঠাকুরঝির নাম নাটকে যথাক্রমে রমা ও শ্যামা। উপন্যাসে এই নাম দু'টি ব্যবহৃত হয় নি।

'কবি' উপন্যাসটি যখন রূপান্তরিত হ'ল 'কবি' নাটকে তখন পরিণতিতেও কিছুটা পার্থক্য দেখা গেল। উপন্যাসের শেষে নিতাই এসে দাঁড়ালো ঠাকুরঝির প্রেমের স্মৃতিবিজড়িত কৃষ্ণচূড়া-তলায়। সেখানেই রাজনের মুখে সে ঠাকুরঝির মৃত্যুসংবাদ শুনল। অবিরল ধারায় অশ্রু ঝ'রে পড়ল তার চোখ দিয়ে। কিন্তু "কান্নার মধ্যেই আবার তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। না,— ঠাকুরঝি মরে নাই, সে যে স্পষ্ট দেখিতেছে, ওই যেখানে রেলের লাইন দু'টি একটি বিন্দুতে মিলিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে দক্ষিণ মুখে নদী পার হইয়া, সেইখানে মাথায় টোপর দেওয়া একটি কাশ ফুল হিল হিল করিয়া দুলিতেছে, আগাইয়া আসিতেছে যেন। সে আছে, আছে, আছে। এখানকার সমস্ত কিছুর সঙ্গে সে মিশিয়া আছে।" এই অনুভব নিতাইকে শান্তি দিয়েছে। অথচ নাটকের শেষে ঠাকুরঝির মৃত্যুতে নিতাইয়ের বেদনা-দীর্ণ হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়েছে মর্মান্তিক হাহাকার —

"এই খেদ মোর মনে
ভালবেসে মিটিল না সাধ কুলাল না এ জীবনে
হায় জীবন এত ছোট ক্যানে
হায়!"

কোনো সান্ত্বনার আভাসই ফুটে ওঠেনি সেখানে।

তাছাড়া নাটকের অন্তিমে ঠাকুরঝির মৃত্যুই নিতাইকে বেদনা-দীর্ণ করেছে। অথচ উপন্যাসের উপসংহারে শুধু ঠাকুরঝি নয়, বসনের কথাও আছে— "ঠাকুরঝি, বসন — দুইজনে যেন পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে। মিশিয়া একাকার হইয়া যাইতেছে।"

'কবি' উপন্যাসের নাট্যরূপে থীমেরও খানিকটা পরিবর্তন ঘটেছে। উপন্যাসে দেখি নিতাই কবিয়াল গানের নেশায় বুঁদ হ'য়ে জীবনের পথে চলেছে। তার জীবন অনন্তে প্রসারিত। ঠাকুরঝি বা বসন — কেউই তাকে চিরদিনের জন্যে বাঁধতে পারে নি। ঠাকুরঝির স্মৃতি নিতাইয়ের অফুরন্ত সংগীতরচনার উৎস। ঠাকুরঝিকে হারাবার বেদনা নিতাইয়ের পক্ষে দুঃসহ। তবু তার নিরাসক্ত কবি-জীবনে তা সান্ত্বনায় রূপান্তরিত। নাটকে কিন্তু ঠাকুরঝিকে হারাবার ব্যক্তিগত বেদনাই তীব্র হ'য়ে উঠেছে।

'কবি' উপন্যাসের নায়ক নিতাই কবিয়াল। উপন্যাসে তাই বহু গান সংকলিত হয়েছে। গানগুলি গীতিকার তারাশংকরের কৃতিত্বের পরিচায়ক। কয়েকটি গান অত্যন্ত বিখ্যাত। উপন্যাসের অনেকগুলি গান নাটকেও গৃহীত হয়েছে। তবে উপন্যাসের একটি বিখ্যাত গান — "কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে"— নাটকে বর্জিত হয়েছে।

'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসে (১৩৫৯) চিকিৎসা ও আরোগ্যের প্রেক্ষিতে প্রাচীন ও নবীনের দ্বন্দ্ব রূপায়িত হয়েছিল। উপন্যাসে এই দ্বন্দ্বের বহুশাখায়িত রূপায়ণ ঘটেছিল, নাটকে তাকে সংকুচিত করা হয়েছে। 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাস হিসেবে যথেষ্ট দীর্ঘ অথচ নাটকটি আকারে যথেষ্ট পরিমিত (চার অঙ্কের)। ফলে বহু ঘটনা, নাটকীয় মুহূর্ত নাটকে বাদ দিতে হয়েছে। মৃত্যুতত্ত্ব ও জীবন-মৃত্যুর সম্পর্ক মূল বিষয় হওয়ায় 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসে বর্ণনা ও বিশ্লেষণের

একটি বড় ভূমিকা ছিল। নাট্যরূপে তার অনেকটাই বাদ পড়েছে। প্রদ্যোতের সঙ্গে জীবন ম'শায়ের রক্তের সম্পর্ক আবিষ্কার নাটকের নূতন উপাদান। জীবন ম'শায়ের নিদান ঘোষণাকে ব্যর্থ ক'রে দিয়ে ভুবন রায়কে প্রদ্যোতের সুস্থ ক'রে তোলা, ভুবন রায়ের দৌহিত্রী মঞ্জুর সঙ্গে প্রদ্যোতের প্রেম, প্রদ্যোতের সঙ্গে বিয়ে দিতে ভুবন রায়ের অসম্মতি, প্রদ্যোতের অসুস্থতায় জীবন ম'শায়ের চিকিৎসা, অবশেষে প্রদ্যোতের সঙ্গে জীবন ম'শায়ের রক্তের সম্পর্ক আবিষ্কার প্রভৃতি প্রসঙ্গ নাটকে নবাগত উপাদান। উপন্যাসের বহুধাবিস্তৃত কাহিনীকে নাট্যকার শেষ পর্যন্ত একটি পারিবারিক প্রেক্ষপটে সীমাবদ্ধ করেছেন।

উপন্যাসের মতো 'আরোগ্য নিকেতন' নাটকের - (ভাদ্র, ১৩৬৩) - ও প্রধান চরিত্র জীবন ম'শায়। নাটকে পরিবর্তিত করার সময় নাট্যকার এই চরিত্রটির কোনো মৌলিক পরিবর্তন সাধন করেন নি। উপন্যাসে জীবন ম'শায়ের ব্যক্তিসত্তার সমগ্র চেহারাটি দেখেছিলাম। নাটকে সেই চরিত্রটি খণ্ডিত। উপন্যাসে জীবন ম'শায়ের চরিত্র বহুবর্ণময়। নাটকে তাঁর চরিত্র বর্ণবিরল। তবে চরিত্রের মূল কাঠামো এক। উপন্যাসে জীবন ম'শায়ের একমাত্র পুত্রের নাম ছিল বনবিহারী। নাটকে সে সত্যবন্ধু। কিন্তু বনবিহারীর জীবন-কথার সঙ্গে সত্যবন্ধুর জীবন-কথার অমিল অনেকটাই। প্রদ্যোত চরিত্রের মূল কাঠামো উভয়ত এক। তবে প্রদ্যোতের সঙ্গে জীবন-মশায়ের রক্তের সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টি নাটকে নয়া সংযোজন। উপন্যাসে ভুবন রায় চরিত্রটি ছিল না। মঞ্জু চরিত্রটি ছিল। তবে মঞ্জু সেখানে প্রদ্যোতের স্ত্রী। তাদের প্রেম সেখানে নেহাতই দাম্পত্য প্রেম। নাটকে মঞ্জুর সঙ্গে প্রদ্যোতের বিয়েকে উপলক্ষ ক'রে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। এর কোনো আভাস উপন্যাসে ছিল না।

'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসে আয়ুর্বেদশাস্ত্রের সঙ্গে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দ্বন্দ্বের পটভূমিতে তারাশংকরের কথাসাহিত্যের মূল প্রসঙ্গ — প্রাচীন নবীনের

দ্বন্দ্ব বাণীবদ্ধ হয়েছিল। নাটকে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পারিবারিক সম্পর্কের জটিলতা। উপন্যাসে মৃত্যু নিয়ে সূক্ষ্ম দার্শনিক আলোচনা অনেকটা স্থান দখল ক'রে আছে। প্রাচীন ভারতীয় আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে জীবন মশায় মৃত্যুকে দেখেছেন। জীবন মশায়ের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন তারাশংকরও উপন্যাসে মৃত্যুতত্ত্বকে প্রাচীন ভারতীয় চিন্তার আলোকেই প্রধানত উপস্থাপিত করেছেন। প্রদ্যোত মৃত্যুকে দেখেছে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে। ফলে মৃত্যুচেতনাকে নিয়ে উপন্যাসে গভীরতা সঞ্চারিত হয়েছে। নাটকে পারিবারিক সম্পর্কের জটিলতার ওপর গুরুত্ব দেওয়ায় ঐ গভীরতা অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

উপসংহার :

রবীন্দ্রনাথ ও তারাশংকর — দু'জনই ছিলেন অতৃপ্ত শিল্পী। এই শৈল্পিক অতৃপ্তি দূর করতে তাঁরা নব নব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তাঁদের সৃষ্টিকে পরিচালিত করেছেন। গল্পকে নাটকে রূপান্তরিত করতে গিয়ে অথবা উপন্যাসকে নাট্যরূপ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও তারাশংকর মূলত একই ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। অর্থাৎ (১) নূতন নূতন ঘটনার সংযোজন, পুরনো কিছু কিছু ঘটনার বর্জনের মাধ্যমে প্লটের পরিবর্তন - সাধন ; (২) পুরনো কোনো কোনো চরিত্র বর্জন এবং নূতন কিছু চরিত্র-সৃজন ; (৩) পুরনো চরিত্রের নূতন নামকরণ তথা পুরনো চরিত্রের মূল কাঠামোর পরিবর্তন ; (৪) থীমের পরিবর্তন- সাধন ; (৫) পরিণতিতে পার্থক্য-সৃজন ; (৬) নূতন গানের সংযোজনা। মাধ্যমের পরিবর্তনের মূলে, দু'জনের ক্ষেত্রেই, সক্রিয় ছিল নিছক শৈল্পিক প্রবর্তনা এবং খানিকটা বাইরের তাগিদ। গল্প বা উপন্যাসকে নাটকে রূপান্তরিত করার মূলে সমকালীন রঙ্গমঞ্চের খানিকটা তাগিদ ছিল। বিশেষত তারাশংকরের ক্ষেত্রে। পুরনো সৃষ্টিকে নূতন রূপ দিতে গিয়ে দু'জনই যে সব পরিবর্তনগুলি ঘটিয়েছেন তার মর্মমূলে সক্রিয় ছিল স্রষ্টার সামগ্রিক জীবন-দৃষ্টির পরিবর্তন তথা

যুগ-প্রেক্ষিতের পরিবর্তন। সময়ের পরিবর্তনে অনেক নূতন উল্লেখ-অনুষঙ্গ নূতন সৃষ্টিতে এসেছে। এক রূপকল্পের রচনাকে অন্য রূপকল্পে পরিবর্তিত করার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও তারাশংকরের মধ্যে খানিকটা পার্থক্যও চোখে পড়ে —

১। উপন্যাসের নাট্যরূপান্তরকালে রবীন্দ্রনাথ কখনো উপন্যাসের অংশবিশেষকে ব্যবহার করেছেন, যেমন, 'রাজর্ষি'-কে 'বিসর্জনে' রূপান্তরের ক্ষেত্রে। তারাশংকর কিন্তু উপন্যাসের নাট্যরূপান্তরে সমগ্র উপন্যাসকেই সর্বত্র ব্যবহার করেছেন।

২। 'বউঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসটি রূপান্তরিত হয়েছিল 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকটি আবার পরে 'পরিত্রাণে' এবং 'পরিত্রাণ' 'মুক্তধারা'য়। অথচ 'মুক্তধারা'র সঙ্গে 'বউঠাকুরাণীর হাটে'-র মিল প্রায় নেই বললেই চলে। তারাশংকর তাঁর কোনো গল্প বা উপন্যাসকে এতবার রূপান্তরিত করেন নি।

৩। একই কাহিনীকে বিচিত্র নাট্যরূপান্তরের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল নাটককে অধিকতর সংহত ও ঐক্যময় ক'রে তোলা। এই ধরনের কোনো উদ্দেশ্য তারাশংকরের ক্ষেত্রে দেখা যায় না।

৪। রবীন্দ্রনাথ যখন কোনো গল্প বা উপন্যাসকে নাট্যরূপ দিয়েছেন তখন ক্রমশ স্থান ও কালের বাস্তবতা অপসৃত হয়েছে, এসেছে অমূর্ততা ও তাত্ত্বিকতার প্রাধান্য। যেমন, 'শেষের রাত্রি' গল্পে কাহিনীর প্রাধান্য ছিল, কিন্তু 'গৃহপ্রবেশে' মৃত্যু যে একটি মহত্তর জীবনে প্রবেশ তার সংকেত করা হয়েছে। তারাশংকরের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বপ্রাধান্য দেখা যায় না।

৫। তারাশংকর কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁর গল্পকে প্রথমে উপন্যাসে পরিবর্তিত করেছেন, পরে আবার সেই উপন্যাসকে নাটকে রূপান্তরিত করেছেন। যেমন, 'কবি' নামে যে গল্পটি ১৩৪৭ সালের কার্তিক সংখ্যা প্রবাসীতে লিখেছিলেন তারাশংকর, সেই গল্পটিকেই পরিবর্ধিত ক'রে ১৩৬৪ সালের আষাঢ়ে তিনি প্রকাশ করলেন তাঁর বিখ্যাত ও জনপ্রিয় উপন্যাস 'কবি'। 'বোবা কান্না' গল্পটি তারাশংকর লিখেছিলেন ১৩৫১ সালের পুজো সংখ্যা 'আনন্দবাজারে'। গল্পটি ত্রিপুরা ভট্টাচার্যের দৈববিশ্বাস এবং মিহির ডাক্তারের বিজ্ঞানচেতনার দ্বন্দ্বের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। গল্পটিকে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ক'রে তারাশংকর লিখলেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'আরোগ্য নিকেতন' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১)। ১৩৪৫ সালে পরিচয়ের আষাঢ় সংখ্যায় তারাশংকর লিখেছিলেন 'মা' গল্পটি। এই গল্পটিকেই রূপান্তরিত ক'রে তিনি লিখলেন 'কালিন্দী' উপন্যাসটি (ভাদ্র, ১৩৪৭)। উপরোক্ত তিনটি উপন্যাসকেই পরবর্তীকালে তিনি নাট্যরূপ দিয়েছিলেন, যথাক্রমে 'কবি' (আষাঢ়, ১৩৬৪), 'আরোগ্য নিকেতন' (ভাদ্র, ১৩৬৩), 'কালিন্দী' (১৩৪৮) নাটক। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এমনটা হয় নি। তিনি তাঁর কোনো রচনাকে এইভাবে দু'বার দুই ভিন্ন রূপকল্পে পরিবর্তিত করেন নি।

৬। তারাশংকরের ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও প্রত্যক্ষভাবে না হ'লেও পরোক্ষভাবে কোনো কোনো গল্প বড় উপন্যাসের উৎস হ'য়ে রয়েছে। যেমন 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' ও 'নাগিণী কন্যার কাহিনী' উপন্যাস দু'টি লিখতে গিয়ে যথাক্রমে 'যাদুকরী' ও 'বেদেনী' গল্প দু'টি ও তাদের পটভূমি তারাশংকরকে প্রভূত সাহায্য করেছিল। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এমনটা দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ - বা পরোক্ষভাবে কখনো তাঁর কোনো গল্পকে উপন্যাসে পরিবর্তিত করেন নি।

৭। তারাশংকর অন্তত একটি ক্ষেত্রে তাঁর একটি ক্ষুদ্র উপন্যাসকে বিস্তৃত ক'রে কয়েক খন্ডব্যাপী দীর্ঘ উপন্যাস রচনা করেছেন। যেমন, 'কীর্তিহাটের কড়চা'-র বীজরূপ পাওয়া যায় 'জবানবন্দী' উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথ এমন পরিবর্তন কখনো করেন নি।

৮। ১৯৩৬ সালে 'রাজর্ষি' উপন্যাসের শেষাংশ, যে-অংশ 'রাজর্ষি' থেকে 'বিসর্জনে' রূপান্তরের সময় বাদ গিয়েছিল এবং গল্পগুচ্ছের অন্তর্গত 'দালিয়া' গল্প অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ এক নাটক রচনার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু সে নাটক আর লেখা হ'য়ে ওঠেনি। তারাশংকরের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটে নি কখনো। তিনি তাঁর কোনো উপন্যাস ও গল্পের মিলন-সাধন ক'রে নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন নি।

রবীন্দ্রনাথ ও তারাশংকর — দু'জনই তাঁদের এক রূপকল্পের রচনাকে অন্য রূপকল্পে পরিবর্তিত করতে গিয়ে কখনো একই ধরনের প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছেন, কখনো আবার তাঁদের অবলম্বিত প্রক্রিয়ায় পার্থক্যও দেখতে পাই। এই মিল ও অমিল সচেতন সাহিত্যপাঠকের কৌতূহলের বিষয় হ'য়ে উঠতে পারে।

॥ উল্লেখপঞ্জী ॥

১। অশ্রুকুমার সিকদার — রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য : প্রথম আনন্দ সংস্করণ ; জানুয়ারি , ১৯৯৩ , পৃ - ২২ ।

২। তদেব , পৃ - ৫১ ;

৩। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় : রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা (৫ম সং), ১৩৬৯, পৃ - ৩৩৪ ।

৪। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় — রবীন্দ্র - জীবনী (২য় খণ্ড) বিশ্বভারতী , ১৩৬৮ , পৃ - ১৯৮ ।

৫। অশ্রুকুমার সিকদার — রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য : প্রথম আনন্দ সংস্করণ ; জানুয়ারি , ১৯৯৩ , পৃ - ৩০ ।

৬। তদেব , পৃ - ২৮ ।

৭। রবীন্দ্র - বীক্ষা , সংকলন - ৬ ।

৮। দেশ : ১ ভাদ্র , ১৩৬৮ ।

৯। তদেব ।

১০। প্রায়শ্চিত্তের বিজ্ঞাপন , রবীন্দ্র রচনাবলী ৬ , (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) পৃ - ২৪৩ ।

১১। প্রবোধচন্দ্র সেন — ভারত - পথিক রবীন্দ্রনাথ , ১৯৬২ , পৃ - ১৭৮ ।

১২। প্রমথনাথ বিশী — রবীন্দ্র - নাট্য - প্রবাহ (পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ), ১৯৬৬ , পৃ - ৩৫১ ।

১৩। রবীন্দ্র - বীক্ষা , — সংকলন ৫ , ১৯৮০ ।

১৪। অশ্রুকুমার শিকদার — রবীন্দ্র - নাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য : প্রথম আনন্দ সংস্করণ : জানুয়ারি , ১৯৯৩ , পৃ - ২৬৯ ।

১৫। রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী , পত্র সংখ্যা ২৪০ , দেশ , ১৬ ভাদ্র , ১৩৬৮ ।

১৬। সুধীরচন্দ্র কর : কবিকথা , ১৯৫১ , পৃ: - ৪৩ ।

— X —